[ডঃ সন্‌জিদা খাতুন-কে ভারত থেকে সম্মাননা জানানো হয়; এ উপলক্ষে রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ, খুলনা আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য]

সমবেত সুধী মন্ডলী

আপনাদের সহৃদয় উপস্থিতি এ অনুষ্ঠানকে সার্থক, সুন্দর ও শ্রী মন্ডিত করেছে। এজন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ডঃ সন্‌জিদা খাতুন সংস্কৃতির আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি একাধারে জ্ঞানী ও রবীন্দ্র সংগীতের গুণী শিল্পী। ভিন দেশ থেকে যে সম্মান তিনি বয়ে এনেছেন, তা জাতির তথা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। আমরা তাঁর– পুরষ্কার প্রাপ্তিতে যুগপৎ আনন্দিত ও গর্বিত। আমাদের এ আয়োজন ক্ষুদ্র কিন্তু আন্তরিক। জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদের সকল কর্মীবৃন্দ, সহযোগী সকল সংগীত শিল্পীবৃন্দ; যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের এই আয়োজন– তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করছি।

ধন্যবাদ

[নাট্য নিকেতন, খুলনা আয়োজিত ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন এর শোকসভায় বক্তব্য]

মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত গীত বিদগ্ধ সুধিবৃন্দ

প্রকৃতির এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন সাহেব মহা প্রস্থানের পথে চলে গেছেন। সে পথ থেকে কেও কোন দিনই ফিরে আসতে পারে না, তিনিও আর ফিরে আসবেন না। কিন্তু তাই বলে আমাদের স্মৃতি থেকে তিনি চির বিদায় নেবেন এমন হতে দেওয়া হবেনা বলেই নাট্য নিকেতন কর্তৃক এমন শোক সভার আয়োজন। আমি এজন্যে নাট্য নিকেতন কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শিল্পী তার সৃষ্ট শিল্পের ভেতর দিয়ে মানুষের মনে বেঁচে থাকেন চিরদিন। ওস্তাদ মুন্সী রইসউদ্দিন সাহেব, একাধারে ছিলেন নায়ক এবং গায়ক। তাঁর পান্ডিত্য এবং সৃজন প্রতিভার পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা একটু পরে আসবে। আগে তাঁর মানুষ হিসাবে চারিত্রিক গুণগুলি যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল সেই সম্পর্কে কিছু কথা বলা উচিৎ বলে মনে হয়। আমার সংগে তাঁর সম্পর্ক, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। প্রথম পরিচয়ের দিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার সতীর্থ পূর্ণ চন্দ্র'র বাবা শ্রীশ বাবু ছিলেন ওস্তাদজীর বন্ধু, উনি ওখানে প্রায়ই যেতেন এবং পূর্ণর ভাইকে গান শেখাতেন। কিশোর বয়স– তখন রেকর্ডের নাম করা শিল্পীদের গান গলা ছেড়ে গেয়ে বেড়াই (অবশ্য কোন অনুষ্ঠানে নয়)। হারমোনিয়াম যারা বাজাতে পারে আমাদের ধ্যান ধারণায় তারা তখন প্রকান্ড শিল্পী, আর ওস্তাদ– তার তো কথাই নেই, গান শুনতে যাই কিন্তু ভয়ে ঘরে ঢুকিনে। আশে পাশে ঘুর ঘুর করি– শুনে শুনে একটু আধটু তবলা বাজাই। উনি পূর্ণর ভাইকে বল্লেন– আচ্ছা তোমার সংগে তবলা বাজায় কে?

উত্তর পান– সাধন দা।

আমি এক পাশে জড়সড় হয়ে বসে ঘাম্‌ছি। উনি পরিপূর্ণভাবে আমার দিকে তাকান বলেন, বেশতো বাজান।

অপনি সম্বোধনে আমি খুবই কুন্ঠিত হয়ে আপত্তি তুলি, উনি বলেন– বেশ বাজাও। আমি তখন বেশ একটু সাহস সঞ্চয় করেছি, বিনীত ভাবে বলি আমার তো তবলা বাজানোর খুব ইচ্ছে নয়, যদি দয়া করেন তো একটু গান শিখি।

বিনয়ে খুশি হয়ে বলেন, বেশ গাও। একখানা শুনিয়ে দিই গান। চুপ করে শুনে মন্তব্য করেন, বেশ তুমি যেও আমার ওখানে, গান-তবলা দুটোই তোমাকে শেখাব। তবু আমার কুন্ঠা যায় না দেখে, উনি ঠিক বুঝে ফেলেন। আমাদের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে ওস্তাদ রেখে নিয়মিত গান শেখা চলতে পারে। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, পয়সার কথা ভাবছো, ঠিক আছে পয়সার কথা তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি যেও। তার স্বজাতি নয়, অন্য জাতের ছেলেকে সস্নেহে এমন আপন করে নিয়ে নিরলস সংগীত শেখানো; একি উদার হৃদয়ের পরিচয় নয়, নিঃসন্দেহে আজ বুঝতে পারি এ হৃদয়ের তুলনা হয় না।

খুলনার তুলাপট্টির ওখানে বা হাতি এক দোতলায় উনি থাকতেন। আটটার পর যত ট্যুশানিই থাক, শেষ করে বাসায় ফিরে, গড় গড়ায় বেশ আয়েস করে তামাক সেজে গুড়ুক গুড়ুক অনেকক্ষন টানতেন। ওই অবকাশে আমরা গলা সেধে নিতাম, তান গুলো তৈরী করে নিতাম। তারপর বলতেন, তবলাটা পাড়। তেকাঠায় টাঙ্গানো থাকতো তবলা, পেড়ে নিয়ে তাঁর নির্দেশ মতো বাজাতে বসতাম। উনি খেয়াল রেওয়াজ শুরু করতেন। গভীর রাত পর্যন্ত প্রত্যহ প্রত্যেক দিন– এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। নিজের হাতে তখন রাঁধতে হোতো তাঁকে। স্টোভেই রান্না করে নিতেন। কোন দিন হয়তো রান্না করাই হোত না, হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসতে হোতো। এত অসুবিধার ভেতরেও সংগীত সাধনার নিষ্ঠা থেকে একদিনের জন্যও বিচ্যুত হতে দেখিনি। তখন অত বুঝতাম না, কিন্তু আজ বুঝি। অনেক বাধা বিপত্তির ভেতর থেকেও, অনেক অসুবিধার ভেতর দিয়েই তার নিষ্ঠা ছিল অবিচল।

তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব তখন আসরে যেতেন, অনেক শিল্পীও যেতেন। কেউ শুনতে, কেউ শিখতে, কেউ কোন কঠিন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে, কেউ প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে। তিনি প্রত্যেককেই সন্তুষ্ট করে বিদায় দিতেন, প্রত্যেক গুণীকেই তিনি সম্মানের চোখে দেখতেন।

স্বর্গীয় ধীরেন বাবু অন্ধ বলে তাকেও যত্ন করে গান শিখিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে দু একটা ট্যুশানি করে তার জীবিকা নির্বাহ হতে পারে। তিনি অবশ্য ভাল তবলা বাজাতেন। প্রায়ই গান জমে গেলে গভীর রাতে অন্ধ মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হোতো না, ওস্তাদজীই নিজের পয়সা দিয়ে খাবার আনিয়ে তাকে খাওয়াতেন, ওখানেই শোবার ব্যবস্থা করে পরদিন সকালে হাতে কিছু পয়সা দিয়ে বিদায় দিতেন।

এ উদার হৃদয়ের তুলনা কোথায়।

স্মৃতিচারণ করতে গিযে অনেক কথাই মনে পড়ে, সব কথা গুছিয়ে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিশোর বয়সে ছাত্র জীবনে দুবছর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আর কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছি। দুবছর পর উনি চলে গিয়েছিলেন ঢাকায়, সেখানে তিনি নোতুন করে ঘর বেঁধে শুরু করেছিলেন নোতুন জীবন। সে জীবনও সংঘাতময়, সংগ্রামময়।

সে জীবনের সবটুকু আমি জানি না, কারণ যোগাযোগ তখন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

.....পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর সংযোজন হইল। দেশে সংগীত শিক্ষার উপযোগী বই না থাকায় তিনিই প্রথম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়েও সংগীত শিক্ষা উপযোগী উচ্চমানের গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। এবং পরে সংগীত কাননে তাঁরই অনুশীলনে আবিস্কৃত নোতুন নোতুন রাগ-এর নোতুন ফুল ফুটিয়ে কাননের শোভা শতগুনে বাড়িয়ে তোলেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য সে সব রাগগুলি ডিস্ক্ করে রাখা সম্ভব হয়নি। পূর্বেই বলেছি শিল্পী তার সৃষ্টির মধ্যেই বেঁচে থাকেন। যেমন বেঁচে আছেন– মিঞাকি টোড়ি, দরবারি কানাড়া'র মধ্যে তানসেন, যেমন বেঁচে আছেন বিলাসখানি টোড়ির মধ্যে বিলাস খাঁ। তেমনি ভীমকোষ, ঢাকেশ্বরী, মধুমতির মধ্যে বেঁচে থাকবেন ওস্তাদজী মুন্সী রইসউদ্দিন। তাঁর বিদেহী আত্মা শান্তি লাভ করুক, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে– আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ

[রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ, খুলনা আয়োজিত বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য]

উপস্থিত সুধী মন্ডলী, জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলনের কর্মী ও সভ্য বৃন্দ

আজ শুভ নববর্ষ। ১৩৯৪ সনের প্রথমদিন, ১লা বৈশাখ। এই শুভ দিনে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা সকলকে নিবেদন করছি। আজ নববর্ষ আহ্বানের ক্ষণে মনের কোনে যদি কোন গ্লানি জমে থাকে তবে তাকে মুছে ফেলে দিতে হবে। যদি কোন আবর্জনা স্তুপিকৃত হয়ে থাকে, তবে বৈশাখের তাপস নিঃশ্বাসে তাকে পুড়িয়ে শুচিতা আনতে হবে। মনে মন মিলিয়ে, কর্মে উৎসাহ নিয়ে, শ্রদ্ধার ভিত্তিতে, জীবনে জীবন যোগ করে, আমাদের এই পথ চলা যেন অব্যাহত থাকে, পরস্পরের ভেতর বন্ধুতের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। শুভ নববর্ষ সকলের জন্যে মঙ্গল বয়ে আনুক, এই প্রার্থনা।

ধন্যবাদ

[জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, খুলনা আয়োজিত কবি গান অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য]

বিদগ্ধ শ্রোতৃমন্ডলী এবং সম্মানীয় বিদেশী অতিথিবৃন্দ

সভাপতি হিসেবে কিছু বলা একটা রেওয়াজ। কিন্তু আমি নিজে কণ্ঠ শিল্পী, বক্তা নই। কথা বলতে গিয়ে যদি কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি করে ফেলি, আপনারা নিজ গুনে ক্ষমা করে নেবেন। এই আশা নিয়েই দু চারটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ কোরবো।

কবি গান একটি লোকায়ত শিল্প। এই পর্য্যায়ে যে দীর্ঘ আলোচনা হল সেই আলোচনার ভেতর থেকে একটা কেন্দ্র বিন্দুতে এসে সবাই মিলে কোরাস গেয়ে বলেছি যে, কৃষি ভিত্তিক সমাজে গ্রামই তখন অর্থ যোগান দিত বলে সমস্ত রকম লোক সংগীতের জন্ম গ্রামেই ঘটেছে। সেখানেই তাদের পুষ্টি, সেখানেই তাদের বিকাশ। কবি গানও প্রথম দিকে আদি রসাত্মক এবং খিস্তি খেউর দিয়ে হরু ঠাকুর ও রাম বসু কবিয়ালেদের দ্বারা গীত হলেও, সামন্ত প্রভুদের মনোরঞ্জন অথবা অবসর বিনোদনের জন্য সৃষ্ট হলেও, মূলত গ্রামীন আবহাওয়ায় লালিত ও বিকশিত।

অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বিবর্ত্তনের ধারা বেয়ে এ গান এগিয়ে এসেছে খিস্তি খেউড়ের সীমা ছাড়িয়ে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকের গন্ডী ডিঙ্গিয়ে হরিহর ও মনোহরের কালে ধর্মীয় আড়ালে সমাজ জীবনের সমস্যাদি, সুখ-দুঃখের কথা বলতে গিয়ে এ গান হয়ে উঠেছে লোকায়ত। এবং এই ধারা অনুসরন করে পরে বহু কবিয়াল অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আরো জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এমনকি রাজনৈতিক সমস্যার জটিল প্রশ্ন গুলি নিয়েও কবি গান রচিত হয়েছে। এ পর্যায়ে চট্টলের রমেশ শীল এবং এখানকার নকুল/ রাজেন/ বিজয়/ নিশিকান্ত প্রমুখ কবিয়ালদের উল্লেখ করতে হয়। এবং এদেরই প্রদর্শিত পথে কবি গান হেঁটে চলেছে। ধর্ম্মীয় আবরণ থাকলেও সেটা আজ আর মুখ্য নয়।

গ্রামিন সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থানের সাথে সাথে এই লোকায়ত শিল্প প্রায় বিলুপ্তির পথে।

সুতরাং লোক সংগীতের সমস্ত শাখাকে উজ্জিবীত করতে হলে গ্রামকে যদি স্ব-নির্ভর, স্বয়ং সম্পূর্ন করে তোলা যায়, যদি স্বচ্ছল অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়, বিজ্ঞানের উন্নতির সুবিধা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া যায় তাহলেই– একটা উপলব্ধি ও সত্য দর্শন লাভ করি আমরা। বলতে পারি, তাহলেই মরা গাঙে বান আসবে। অমল-ধবল পালে আবার হাওয়া লাগবে। গ্রামের কবি, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, বাদক, শিল্পীরা আবার মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। নচেৎ বিত্তশালী শহরে বসে, উচ্চ শিক্ষিত বিদগ্ধ মনন নিয়ে পল্লী গান রচনা করে সুর সাগর দিয়ে সুর করিয়ে কিন্নর কণ্ঠ দিয়ে সু-সজ্জিত মঞ্চে গান গাইয়ে বা ড্রয়িং রুমে বসে গান গাইলে, গান হয়তো হবে কিন্তু পল্লীর সেই সহজ, সরল, অনাড়ম্বর নিষ্কলুষ আত্মার সন্ধান পাওয়া যাবে না, তারা হারিয়ে যাবে চিরকালের মত।

যা হোক, কথা অনেক হয়েছে আর নয়। আপনারা যারা এই শীতের কঠিন শাষন উপেক্ষা করে, ধৈর্য্য ধরে আলোচনায় নীরবে অংশ নিয়ে সভাকে সাফল্য মন্ডিত করেছেন এবং যারা সরবে এতে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলকেই আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ যারা একজন সামান্য সংগীত শিল্পীকে সভাপতির পদে বরণ করে সম্মান দেখালেন, তার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং একই সাথে এই সভার সমাপ্তি ঘোষনা করছি।

ধন্যবাদ

[রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ, খুলনা আয়োজিত ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্র উৎসবে সভাপতির বক্তব্য]

১৭ নভেম্বর, ১৯৮৬
সোমবার

শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, গুণী শিল্পীবৃন্দ ও উপস্থিত সুধী শোতৃমন্ডলী

আজ খুলনায় এই প্রথমবার জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ, খুলনা শাখা আয়োজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক শত পঁচিশতম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ জাতিগত ভাবে আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গীকার। রবীন্দ্র চৈতন্যের সামগ্রিক প্রতিভাষা আমাদের সত্বার গভীরে অন্ত সলীলা ভাবে বাঁচার কথা বলে, শুদ্ধ ভাবে বাঁচতে শেখায়। যেখানে জীবনের হীনতা, শুদ্ধতার বিপর্যয়, যেখানে আত্মার সাথে বাণীর আত্মীয়তা নেই, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আমাদের সংগ্রামী করে তোলে– বাঁচার সংগ্রামে, জীবনের সংগ্রামে, তিলে তিলে অবমাননার হাত থেকে মুক্তির সংগ্রামে, শান্তির সংগ্রামে। আর তাই এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের বড় প্রযোজন। বিগত '৭১-এর মুক্তি সংগ্রামের কথা সকলেরই মনে আছে। একটি গান, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' কোন মার্চ সংগীত নয়, কোন মার্শাল সংগীত নয়, কেবল ভালবাসা, এই ভালবাসার বাণী কি অমোঘ শক্তি জুগিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে সমস্ত জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ আজ একমাত্র সঞ্জীবনী।

আজকের এই রবীন্দ্র উৎসবে বিদেশী জ্ঞানী-গুনি শিল্পী, স্বদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত জ্ঞানী-গুনি শিল্পী ও স্থানীয় জ্ঞানী-গুনি শিল্পী এবং সর্বস্তরের জনগণকে রবীন্দ্র উৎসবের মহতী অনুষ্ঠানের সূচনা লগ্নে আমি জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ, খুলনা শাখার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি।

আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছেন শান্তি নিকেতন থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রী শান্তিদেব ঘোষ ও বিশেষ অতিথি হয়ে এসেছেন শ্রীমতি কনিকা বন্দোপাধ্যায়। আমি এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

ধন্যবাদ

[কবিতালাপ, খুলনা আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য]

৬)

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি ও সমবেত সুধী মন্ডলী

প্রায় এক যুগ আগে শীতকালে এমনি এক সন্ধ্যায় আমাকে নিয়েই একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন স্কুল অব মিউজিক, খুলনা'র প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আজিজ খান সাহেব। তিনি ভেবেছিলেন সমাজের গঠন প্রক্রিয়ায় এক অংশের কারিগর শিল্পীরা, সুতরাং সংগীত শিল্পীরাও এ থেকে বাদ নয়। তাদের আর্থিক সংগতি না থাক সমাজ জীবনে তাদের পরিচিতি ও সামাজিক মর্য্যাদা থাকা উচিৎ। যারা সরকারি অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েও, দেশের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম থেকে দূরে থেকেও, সংগীতের মাধ্যমে সমাজে কিছু করার চেষ্টা করেছেন বা করে যাচ্ছেন সেই সব শিল্পীদের মানুষের সামনে তুলে ধরা। শিল্পীদের তাদের কর্মে উৎসাহিত করা। এই দৃষ্টিকোন থেকেই তিনি সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন এবং আমাকে বেছে নিয়েছিলেন।

এক যুগ পর, আজকের এই বৈশাখী সন্ধ্যায়, আমাকে বেছে নিয়েই সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন কবিতাালাপ। দেশে এতো নমস্য জ্ঞানী-গুনী কবি-সাহিত্যিক থাকতে এক সংগীত শিল্পীকে তারা কেনো বেছে নিলেন, এ প্রশ্ন সকলের মনে যেমন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, আমার মনেও ঠিক তেমনি। এর জবাবে কবিতাালাপ যে বক্তব্য রাখবেন, তা শুনে কেউ হয়তো খুশি হবেন আবার কেউ হয়তো হবেন না। কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিগত দিক থেকে বলি, আমি পেলাম অনেক। উদীয়মান তরুণ কবিদের হৃদয়ের একটি কোনে শ্রদ্ধার একটি আসন, এই দুর্লভ বস্তুটি পেয়ে ধন্য হলাম। এ আনন্দ, এ খুশি চিরকালের জন্য হৃদয়ের মনিকোঠায় জমা হয়ে রইল। সেই সংগে পেলাম উপস্থিত সুধী মন্ডলীর উষ্ণ সান্নিধ্য। দূরাগত বন্ধুদের সংগে মিলনানন্দ। হাজারো কাজের চাপেও ছিনিয়ে আনা সময় হাতে নিয়ে, এক অনামী শিল্পীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও মাননীয় প্রধান অতিথির আন্তরিক উপস্থিতি। বন্ধু বক্তাদের বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে উপচে পড়া প্রগাঢ় ভালবাসার পরশ।

কন্ঠ শিল্পীদের আন্তরিক যোগদান। সব মিলিয়ে এ সন্ধ্যা একটি পূর্ণতার সন্ধ্যা।

সুতরাং আজকের এই বৈশাখী সন্ধ্যার স্মৃতি আমৃত্যু আনন্দ ও প্রেরণা যুগিয়ে যাবে। এই বিশ্বাস নিয়ে কবিতালাপ-কে, উপস্থিত সুধী মন্ডলীকে, প্রিয় বক্তা বন্ধুদের, কন্ঠ শিল্পীদের, শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও মাননীয় প্রধান অতিথিকে এবং অনুষ্ঠানে যোগদানকারি প্রত্যেক্‌কেই অন্তরের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ

[বি এম এ, খুলনা আয়োজিত সংগীত শিল্পী দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একক সংগীতানুষ্ঠানে বক্তব্য]

সমবেত সুধী মন্ডলী

প্রথমেই আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, এই জন্যে যে আমি বক্তা নই, গুছিয়ে কথা বলার অভ্যাস আমার নেই। শিল্পী সম্পর্কে দু একটি কথা যা বলার তা আমি লিখে এনেছি, পাঠ করে শোনাব। আপনারা আমার ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন। আজ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একক সংগীত পরিবেশনের আয়োজন করেছেন, B. M. A. , খুলনা কর্তৃপক্ষ। তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও উচ্চ প্রশংসা জানাই।

শিল্পীর ছোটবেলা সংগীতের পরিবেশেই শুরু হয়েছিল। বাবা লোহিত কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতিমান নাট্য শিল্পী ছিলেন। আমরা তাকে শিবুদা বলে ডাকতাম, মায়ের কণ্ঠ মাধুর্য ছিল অতি সুন্দর। তাঁকে সংগীতে তালিম দিতেন আমার সংগীত গুরু শ্রী কালিদাস চট্টোপাধ্যায়। মায়ের কাছেই শিল্পীর হাতে খড়ি।

শিল্পী যখন সিক্স্-সেভেনের ছাত্রী তখন গুরু কালিদাস চট্টোপাধ্যায় শিল্পীকে গান শেখানোর ভার দিলেন আমার ওপর, আর সাহস দিলেন, যদি অসুবিধা বোধ কর আমিত রইলাম। সেই থেকে সেখনো শুরু। চল্ছিল ভাল কিন্তু তিন চার বছর পর সংসারে নেমে এলো দূর্যোগ। কমার্স কলেজ সম্প্রসারণের প্রয়োজনে বাড়ীটা বিক্রি করতে হল, ঠাঁই নিতে হল ভাড়া বাড়ীতে। লব্ধ অর্থে ব্যবসা করতে গিয়ে অর্থনৈতিক সংকটের সন্মুখীন হলেন শিবুদা। তারপর হল মা-এর মানসিক ব্যধি, সংসার একেবারে বিধ্বস্ত। এই প্রচন্ড প্রতিকুলতার মধ্যেও শিল্পী তার একান্ত সাধনা, ঐকান্তিক ইচ্ছা, প্রবল মানসিক শক্তির জোরে, পড়াশোনা এবং সংগীত চালিয়ে আজকের এই ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। এই কারনেই তাঁকে যারা জানে সকলেই সমীহ করে, শদ্ধার চোখে দেখে।

শ্রীমতি দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় মূলতঃ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। নিয়মিত খুলনা বেতারে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে থাকেন। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হলেও ফাঁকে ফাঁকে অতুল প্রসাদের গানও চর্চা করেছেন। এই শিল্পীর যতটা পরিচিতি হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি। কারণ টেলিভিশনের মত শক্তিশালী মাধ্যমে তিনি তখনও সংগীত পরিবেশনের সুযোগ পান নি। ঢাকার টেলিভিশন, ঢাকা গোষ্ঠির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মফঃস্বল শিল্পীদের ওখানে সুযোগ করে নেওয়া প্রায় অসাধ্য। অনেক কাঠ-খড় পোড়ানর পর হয়তো শিকে ছেঁড়ে, কিন্তু এই কাঠ-খড় পোড়ানর ব্যাপারটা সকল শিল্পীই খুশি মনে নেবেন, এমন কথা নেই। যারা নিতে পারবেননা তাদের পরিচিতি সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যেই আটকে থাকে।

এতদ্দেশীয় সংগীত, উত্তর ভারতীয় সংগীতের ধারায় পুষ্ট। এই পথ বেয়ে যাঁরা বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে অনবদ্য সৃষ্টির অবদান রেখেছেন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্জন ও গ্রহণ-এর মাধ্যমে উন্নতীর শিখরে তুলেছেন, সেই মহান গীতিকার ও সুরকার দীজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় সংগীতের ধারায় অবগাহন করেই করেছেন। যাদের কান এই সংগীত শ্রবনে অভ্যস্ত। অতুল প্রসাদ, অনেকেই হয়তো জানেন, তিনি লখনৌতে ব্যারিস্টারি করে প্রভুত অর্থ উপার্জন করেছিলেন বটে কিন্তু সাংসারিক জীবনে শান্তি ছিলনা। লখনৌয়ের বহু সংগীত ওস্তাদের সংগে তার ঘনিষ্টতা ছিল। বহু সংগীত গুনী অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্য সম্মেলনও করেছেন কয়েকবার। মূলতঃ তার সংগীতের আবহ লখনৌ এর ঘরানা থেকেই সৃষ্টি। এবং তার রচিত গানগুলি মনে প্রশান্তির অভাব হেতু প্রচ্ছন্ন বেদনায় আবরিত।

এবার তাহলে, অতুল প্রসাদের নির্বাচিত গান শোনা যাক। পরিবেশন করছেন শ্রীমতি দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবলায় সংগত করবেন প্রখ্যাত তাবলিক মঃ সাদতকি। তানপুরায় .....। ওদের আসরে আহ্বান করার আগে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার লেখা পাঠ এখানেই শেষ করছি। ..... আসুন, আপনারা আসরে আসন গ্রহণ করুন।

ধন্যবাদ